মওলানা মওদূদীর
বহুমুখী অবদান

আব্বাস আলী খান

মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান

আব্বাস আলী খান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

শপ্র:৫০

মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান

আব্বাস আলী খান

প্রকাশনায়

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ ওয়ারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর '৮৫

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৪

মুদ্রণে

আল্ ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

নির্ধারিত দাম : ১২.০০ টাকা

সূচীপত্র

- মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান ৪
- ইসলামী পুনর্জাগরণ ৬
- ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ১২
- রাজনীতির অংগনে মাওলানার অবদান ১৬
- মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মাওলানার অবদান ১৮
- তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান ২০
- সীরাতে সরওয়ারে আলম ২১
- এক নজরে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ২৩
- মাওলানা মওদূদী প্রণীত গ্রন্থাবলী ২৯

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাওলানা মওদূদীর মহুমুখী অবদান

এ কথা মহাসত্য যে, যে কোন কালে যে কোন যুগে মানবজাতি যখনই আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জীবন ব্যবস্থা পরিহার করে স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, আল্লাহ্‌র নাফরমানির জীবনযাপন শুরু করেছে, তখনই তাদের জীবনে নেমে এসেছে লাঞ্ছনা, দুঃখ দারিদ্র ও অপরের গোলামির অভিশাপ।

বিশ্বস্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে তাঁর প্রিয় নবীগণের মাধ্যমে মানুষের জন্যে তাদের উপযোগী একমাত্র কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা পাঠিয়েছিলেন। এ জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মাধ্যমে। তা ছিল সর্বকালের সকল দেশের মানুষের জন্যে একমাত্র মংগলকর ব্যবস্থা। সর্বশেষ নবীর তিরোধানের পর নবুয়্যতের এ মহান দায়িত্ব অর্পিত হয় উম্মতে মুসলিমার উপরে। তাদের জীবনের মিশন হয়ে পড়ে মানবজাতিকে সত্যের দিকে, ভালোর দিকে, মঙ্গলের দিকে আহ্বান করা এবং দুস্কৃতি, পাপ ও অকল্যাণকর কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা। বিগত দেড় হাজার বছরে আল্লাহ্‌র বহু নেক বান্দাহ এ মহান কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন।

সত্য কথা এই যে, মুসলমান ও গোলামি,- সে গোলামি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক হোক অথবা মানসিক ও সাংস্কৃতিক- এ দু'টি কখনো একত্র হতে পারেনা। এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, কোন প্রকার গোলামির পরিবেশে মুসলমান তার দ্বীনের দাবী পূরণ করতে পারে। কারণ ইসলাম তাকে সকল গোলামি ও আনুগত্যের শৃংখল থেকে মুক্ত করে একমাত্র খোদার অনুগত বানিয়ে দেয়। তাই সত্যিকারের মুসলমানের মেজাজ প্রকৃতিই এই হয় যে সে তাগুতের, খোদাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবে। তা উৎখাত করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র খোদার আনুগত্য ও তাঁর শেষ নবীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

বিগত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে এ সমস্যাটি বিরাট আকারে দেখা দিয়েছিল। ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের সকল শক্তি এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল যে, মুসলমানদের জাতীয় জীবনে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিকৃতি ও অধঃপতন

ঘটেছিল তা যেন চরমে পৌছে যায় যাতে করে মুসলমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, নৈতিক, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে একেবারে গোলাম জাতিতে পরিণত হয় এবং তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র একেবারে বিলুপ্ত না হলেও আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও আমল-আখলাকের দিক দিয়ে সামগ্রিকভাবে তাদের মধ্যে বিরাট বিকৃতি এসেছিল। কিছু লোক পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পরিহার করে এমন বহু কিছুকে ধর্মের রূপ দিয়েছিল যা কুরআন হাদীস ও নবী জীবনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়না। শাহ অলীউল্লাহ (রঃ) তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে এ সবের খন্ডন করে মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামকে তুলে ধরেন এবং ইসলামী চিন্তাধারার জাগরণ সৃষ্টি করেন। পরবর্তী কালে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) ইসলামকে একটা গতিশীল ও প্রাণবন্ত জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে 'তাহ্‌রিকে মুজাহেদীন' নামে এক আন্দোলন শুরু করেন এবং তিনটি সম্মিলিত ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। কিন্তু ১৮৩১ সালে এ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের মধ্যে 'আপোষ-মীমাংসার' দৃষ্টিভংগী শক্তিশালী হয়। মুসলমানদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল একটা পরাজিত সেনাবাহিনীর মতো। যারা মানসিক দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল, তারা আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সমঝোতা করে সে রঙেই নিজেদেরকে রঞ্জিত করার আহ্বান জানায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজে এক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। একটি শ্রেণী উদ্ভুত পরিস্থিতি ও তার চাহিদার প্রতি একেবারে উপেক্ষা প্রদর্শন করে অতীতের মনোহর দৃশ্যপটে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারেনি। বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে এমনভাবে অবস্থার মোড় পরিবর্তন হয় যে দেশের কার্যকলাপে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পুরাতন বন্ধুত্ব ভেঙে যায় নতুন শত্রুতা শুরু হয়। সাময়িকভাবে এবং ঘটা করে বড়ো বড়ো কাজও করা হয়। কিন্তু মুসলমানদের সামনে এমন কোন পথ সুস্পষ্ট ছিলনা যাতে করে একদিকে তারা গোলামি থেকে মুক্ত হতে পারে এবং আযাদির প্রশস্ত ময়দান তার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তাদের সম্পর্ক তাদের দ্বীন এবং সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে দৃঢ়তর করে ঐসব ঐতিহাসিক দাবী পূরণে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে যার জন্যে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় মুসলমানদের মন অধীর চঞ্চল হয়েছিল। কিন্তু

রাজনীতির চাবিকাঠি এমন সব লোকের হাতে ছিল যারা জাতির মেজাজ প্রকৃতি ও দ্বীনের চাহিদা সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি রাখতোনা। যে আলেম সম্প্রদায় দীর্ঘকাল যাবত জাতির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল তাঁদের অধিকাংশ ধীরে ধীরে আপন আপন দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন যেহেতু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নতুন সমস্যাবলী সত্যিকারভাবে অনুধাবনের কোন প্রমাণ তাঁরা পেশ করতে পারেননি। গোটা জাতি বহুমুখী সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ হয় এবং জীবন পথের চৌমাথায় উপনীত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

ইসলামী পুনর্জাগরণ

মুসলমান জাতির ঠিক এমন এক দুঃসময়ে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার সূচনা করেন।

এ সম্পর্কে নবী পাকের (সঃ) যে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (আবু দাউদ) তার মর্ম এই যে, ইনশাআল্লাহ্ ইসলামী ইতিহাসের কোন এক শতাব্দীও এমন লোকদের থেকে বঞ্চিত হবেনা যারা জাহেলিয়াতের আগ্রাসনের মুকাবিলা করবেন এবং ইসলামকে তার আসল প্রাণশক্তি ও রূপে আকৃতিতে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা চালাবেন। ইসলামী পরিভাষায় এমন লোককে বলা হয় মুজাদ্দিদ।

মুসলমানদের দ্বীনী, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তাদের ভেতর ও বাইরের পরিবেশ এটাই দাবী করছিল যে, এখন একজন সমাজ সংস্কারক বা মুজাদ্দিদের প্রয়োজন যার কাজ হবে নিম্নরুপ ঃ

১. বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির নির্ভুল মূল্যায়নের পর ইসলামকে তার আসল রূপে সমাজের সামনে তুলে ধরা। ইসলামের মধ্যে কতোটুকু বিকৃতি এসেছে, জাহেলিয়াত তার দেহের ভেতর কোথায় এবং কতোটুকু পরিমানে অনুপ্রবেশ করেছে, কোন্ পথে তার আগমন, কোথায় তার শিকড় এবং বিস্তৃতি তার কতোখানি এ সব কিছু সঠিকভাবে নির্ণয় করা।

২. সংস্কার সংশোধনের পরিকল্পনা করা। কোথায় আঘাত করলে জাহেলিয়াতের বাধন টুটে যাবে এবং ইসলাম পুনরায় একটা বিজয়ী শক্তি হিসাবে সমাজের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা।

৩. আপন শক্তি সামর্থ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা। অর্থাৎ কোন্ পথে, কিভাবে সংস্কার করা এবং তার শক্তি কতোখানি তার একটি নির্ভুল আন্দাজ করা।

৪. মানুষের চিন্তারাজ্যে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করা। অর্থাৎ মানুষের চিন্তাধারা

আকীদা বিশ্বাস, মন মানসিকতা, রুচি প্রকৃতি, আমল আখলাক, জীবন-দর্শন ও জীবনের দৃষ্টিভংগী ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলা এবং ইসলামের সার্বিক পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করা।

৫. যেসব জাহেলী রসম রেওয়াজ বংশানুক্রমে সমাজের বুকে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং ধর্মের নামে যেসব নতুন নতুন বিদয়াত আমদানী করা হয়েছে এসব মূলোচ্ছেদ করে চিন্তা চরিত্র ও মানসিক বৃত্তিসমূহ পরিচ্ছন্ন করা, মানুষের মধ্যে শরিয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার মন মানসিকতা ও প্রেরণা সৃষ্টি করা, ইসলামী নেতৃত্বের যোগ্য লোক তৈরী করা।

৬. দ্বীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা। অর্থাৎ দ্বীনের মূলনীতি ও প্রাণশক্তিকে অক্ষুন্ন ও অমলিন রেখে সমকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শরিয়তের বিধানকে সংগতিশীল করে পেশ করা যাতে করে শরিয়তের প্রানবন্ত অবিকৃত থাকে। তার উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হয় এবং সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামই দুনিয়াকে নেতৃত্ব দান করতে পারে।

৭. ইসলাম বিরোধী শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন (Intellectual aggression) প্রতিরোধ করা ও তা নির্মূল করে ইসলামের বিকাশের পথ
প্রশস্ত করা।

৮. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন করা। অর্থাৎ কুফর ও জাহেলিয়াতের হাত থেকে কর্তৃত্ব প্রভুত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নিয়ে দেশের শাসন ব্যবস্থা ইসলামী শরিয়তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, যা প্রকৃত খেলাফত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৯. এমন এক শক্তিশালী বিশ্বজনীন ইসলামী আন্দোলন সৃষ্টি করা যাতে করে ইসলামের সংস্কারমূলক বিপ্লবী ও কল্যাণময় দাওয়াত বিশ্বমানবতার কাছে বিস্তার লাভ করতে পারে। ইসলাম একটা বিজয়ী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নতুন করে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে এবং মানবজাতি স্থায়ী কল্যাণ ও উন্নতির অধিকারী হতে পারে।

মুসলিম জাতির ইতিহাসে এ ধরনের গুণসম্পন্ন লোক শতাব্দীর মাথায় একজনই পয়দা হয়েছেন দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার একশ বছর পর ১৯৩১ সালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এ মহান কাজের পুনরায় সূচনা করেন।

মাওলানা মওদূদী তাঁর খোদা প্রদত্ত সুক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে মুসলমানদের সব চেয়ে বড়ো দুর্বলতা এই যে তাদের অধিকাংশই ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একেবারেই ছিল অপরিজ্ঞাত। এমনকি তাদের মধ্যে সে সীমারেখাটুকুর অনুভূতিও ছিলনা যা ইসলামকে কুফর থেকে আলাদা করে রাখে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা থেকে তারা ছিল দূরে অবস্থিত।

সাধারণতঃ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষ মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার কোন ব্যবস্থা তাদের জন্যে করা হয়নি। ফলে নওমুসলিমদের অধিকাংশ ঐসব মুশরেকী ও জাহেলী রসম ও রেওয়াজের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি যা ইসলাম গ্রহনের পূর্বে তারা মেনে চলতো। যারা বাইরে থেকে এ দেশে এসেছিল তাদের অবস্থাও ভারতীয় মুসলমান থেকে তেমন বেশী ভালো ছিলনা। পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি তাদের ছিল অধিক আগ্রহ আসক্তি। এখানে আগমন করার পর তারা এখানকার অধিবাসীদের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। ফলে তারা অপরের উপর যেমন কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি অপরের প্রভাবও গ্রহণ করে। ফলে কিছুটা মুসলমানী এবং কিছুটা হিন্দুয়ানী এমন এক মিশ্র সভ্যতা সংস্কৃতির জগা খিচুরী তৈরী হয়। সুফীবাদও এখানে মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে যা ক্রমশঃ বেদান্তবাদ, যোগবাদ, খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদ প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম উম্মার একটা অংশকে মোরাকাবা, মোশাহিদা, রিয়াজাত, কামালিয়াত, মাকামাত, সফর ও হাকীকত প্রভৃতির দার্শনিক ব্যাখ্যার গোলক ধাঁধায় নিক্ষেপ করে।

পরবর্তীকালে দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনে গোলামির জীবন যাপন তাদেরকে ইসলাম থেকে অধিকতর দূরে নিক্ষেপ করে। তাদের জীবনের দৃষ্টিভংগী বদলে যায়। জীবনকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি দুনিয়াদারী, অপরটি দ্বীনদারী। রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশ ও সমাজ পরিচালনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতিকে দুনিয়াদারী ও অবাঞ্ছিত মনে করে তা বর্জন করা হয়। এসব কিছু প্রতারক, চরিত্রহীন, ধর্মহীন ও খোদাবিমুখ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে ইসলামের আংশিক কিছু ক্রিয়া-কর্মকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাকেই দ্বীনদারী মনে করা হয়।

মুসলমান সমাজের এ ছিল এক বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা। আলেম সমাজের একটা বিরাট অংশ জীবনের বাস্তবতার প্রতি চক্ষু বন্ধ করে ছিলেন এবং

ইসলামের আলোকে জীবনের নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হন। একদিকে আলেম সমাজের এ ব্যর্থতা এবং অপরদিকে জড়বাদী ইউরোপীয় সভ্যতা ও কার্ল মার্কস, হেগেল, লেনিন প্রমুখের দর্শন ও মতবাদ শিক্ষিত মুসলমান যুব সমাজকে নাস্তিকতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করছিল। মুসলমানদের এ সংকট সন্ধিক্ষণে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৩১ সালের শেষার্ধে তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কার কাজের সূচনা করেন। তিনি সর্বপ্রথমে ইসলামের সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা জনসমক্ষে তুলে ধরাই সমীচীন মনে করেন। ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিসালায়ে দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি) ঈমান, ইসলাম, নামাজ, রোযা, যাকাত, হজ্ব, জিহাদ প্রভৃতির মর্মকথা, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, দ্বীনে হক (একমাত্র ধর্ম) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি দ্বীন ইসলামকে তার সত্যিকার রূপে ও তার পূর্ণত্ব সহকারে মানব সমাজে উপস্থাপিত করেন। সাথে সাথে যে খোদাহীন পাশ্চাত্য সভ্যতা তার চাকচিক্যময় রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে মুসলমানদের মনমানসকে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করেছিল তারও তীব্র সমালোচনা করে তিনি তান্‌কীহাত (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এ গ্রন্থখানিতে তিনি জাতির মানসিক ব্যাধি ও তার কারণ বিশ্লেষণ করেন। অতঃপর ইসলামী সভ্যতার বিপর্যয়ের ইতিহাস আলোচনা করেন।

আধুনিক সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তিনি তার অন্তঃসারশূন্যতা ও বিষময় পরিণাম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তিনি বলেন, যে পাশ্চাত্য-বাসীগণ আধুনিক সভ্যতার এ বিষবৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করেছিল, তারা আজ নিজেরাই তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কারণ সে বৃক্ষ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এমন বিভ্রান্তি, জটিলতা ও অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে যে, তার সমাধানের যে কোন প্রচেষ্টাই অসংখ্য জটিলতা ডেকে নিয়ে আসে। তারা তার যে কোন ডালপালাই কেটে দেয় সেখান থেকে অসংখ্য কাঁটাযুক্ত ডাল গজায়। যেমন ধরুন, তারা পুঁজিবাদের উপর যেই মাত্র করাত চালিয়ে দিল, অমনি তার থেকে কমিউনিজম বেরুলো, গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানলো, সংগে সংগেই একনায়কত্ববাদ আত্মপ্রকাশ করলো। সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান করতে গেল, নারীত্ববাদ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের আবির্ভাব হলো। নৈতিক উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের

চেষ্টা করলো, তার ফলে আইন লংঘন ও বহুবিধ অপরাধ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। মোটকথা সংস্কৃতি ও সভ্যতার এ .বিষবৃক্ষ থেকে অনাচার অরাজকতার এক অন্তহীন ধারা বেরিয়ে এসে পাশ্চাত্য জীবনকে আপাদমস্তক দুঃখ-বেদনার এক বিরাট বিষফোঁড়ায় পরিণত করেছে। সে ফোঁড়ার জ্বালা-যন্ত্রণা প্রতিটি শিরা-উপশিরা ও স্নায়ুকেন্দ্রে অনুভূত হচ্ছে।

এভাবে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা ও ভয়াবহ পরিণাম ব্যাখ্যা করেন এবং সাথে সাথে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির মংগলকারীতা বর্ণনা করে মুসলিম মানমানসকে পাশ্চাত্যের পশু সভ্যতা থেকে রক্ষা করার সফল চেষ্টা করেন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী আলেমে দ্বীন হিসাবে একজন মুজাদ্দিদের ভূমিকা পালন করেন এবং ইসলামকে জাহেলিয়াতের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করে খাঁটি ও পরিশুদ্ধ ইসলাম পেশ করেন যা পেশ করে ছিলেন আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং যার আলোকবর্তিকা নিয়ে বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রচলিত সুফীবাদেরও গঠনমূলক সমালোচনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন-

যে তাসাওউফের সত্যতা আমরা স্বীকার করি এবং যাকে আমরা পুনর্জাগরিত করতে চাই তা হলো এমন এক তাসওউফ যা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সুফী ফুজাইল বিন ইয়াজ, ইব্রাহীম বিন আদহম্ মারুফ করখী প্রমুখ মনীষীগণ অনুশীলন করতেন। তার কোন পৃথক দর্শন ছিলনা। পৃথক কর্মপদ্ধতি ছিলনা। তাদের চিন্তাধারা ও কাজ-কর্মের উৎস ছিল একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল তাই যা ছিল ইসলামের।

মাওলানা বলেন, যে তাসাওউফের আমরা খন্ডন করতে চাই তা এই যে, তার মধ্যে গ্রীক আধ্যাত্মবাদ, প্লেটোর কামগন্ধহীন মতবাদ এবং যবরদশ্‌তি ও বেদান্ত দর্শনের সংমিশ্রণ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে খৃষ্টীয় পুরোহিত এবং হিন্দু সন্নাসীদের পদ্ধতি শামিল করা হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্যে মানুষকে তৈরী করার পরিবর্তে সম্পুর্ণ অন্য কাজের জন্যে তৈরী করা হয়।

তিনি আরও বলেন, এ দু'ধরনের তাসাওউফ ছাড়া আর এক প্রকার তাসাওউফ আছে যার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের তাসাওউফের পদ্ধতি বের করেছেন এমন বিভিন্ন বুযর্গানে দ্বীন যাঁরা ছিলেন বিজ্ঞ এবং যাঁদের নিয়তও ছিল মহৎ। কিন্তু তাঁরা নিজেদের সময়ের বৈশিষ্ট্য ও অতীত যুগের প্রভাব থেকে মুক্ত

ছিলেননা। ইসলামের সঠিক তাসাওউফ লিপিবদ্ধ করার এবং তার ক্রিয়াপদ্ধতিকে জাহেলী তাসাওউফের কলুষ থেকে পবিত্র করার পূর্ণ চেষ্টা তাঁরা করেছেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের দৃষ্টিভংগীতে কিছু না কিছু বাইরের কার্যপদ্ধতির প্রভাব বিদ্যমান ছিল। .... সে তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ফল ইসলামের উদ্দেশ্য ও বাঞ্ছিত পরিণাম ফল থেকে কমবেশী পৃথক। প্রতিটি মানুষকে নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরী করা এর উদ্দেশ্য নয় এবং কুরআন لتكونوا شهداء على الناس শব্দগুলির দ্বারা যা নির্দেশ করেছে তা শিক্ষা দেয়াও এর উদ্দেশ্য নয়। এমনকি এ তাসাওউফের পরিণাম ফলও এমন হতে পারেনি যার দ্বারা এমন লোক তৈরী হতে পারতো যারা ..... ইকামাতে দ্বীনের চিন্তায় অধীর হতো এবং এ কাজের যোগ্য হতে পারতো।

'তাজদীদ ও এহ্‌ইয়ায়ে দ্বীন' বা ইসলামের পুনর্জীবন ও পুনর্জাগরণের কাজ যারাই করেছেন, ধর্মীয় ক্ষেত্রের কায়েমী স্বার্থ (Vested interests) তাঁদেরকে কখনো ক্ষমা করেনি। তাই প্রথমে মাওলানা মওদূদীর এ কাজের প্রতিবাদ এলোনা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষ থেকে, এলোনা ধর্মহীন নাস্তিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে। প্রতিবাদের ঝড় উঠলো তথাকথিত এক শ্রেণীর আলেমদের পক্ষ থেকে।

ইসলামী পুনর্জাগরণের কাজ যাঁরা করতে পারেননি, বরঞ্চ পক্ষান্তরে ধর্মীয় মসনদে বসে ধর্মের নামে যারা দুনিয়া কামাই করছিলেন তারা তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি শুরু করেন, তাসাওউফ পন্থীগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাদেরই জনৈক অভিযোগকারীর এক পত্রের জবাবে মাওলানা বলেন ঃ

"সম্ভবতঃ আপনার জানা নেই যে, আমি এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, যার মধ্যে এক হাজার বছর যাবত বয়আত ও তাসাওউফের দীক্ষাদানের পরম্পরা জারী ছিল। তার সমস্ত ভালো-মন্দ দিক সরাসরি অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছিল। বাইরের কোন লোকের ন্যায় বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে আমি এসব লক্ষ্য করিনি, বরঞ্চ স্বাভাবিকভাবে এসবের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তারপর যদি আমি এ সিদ্ধান্তে পৌছি যে, ইসলামের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এ প্রতিষ্ঠানটিও বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং এর মধ্যে বেশ কিছুটা রদবদলের প্রয়োজন, তাহলে একে কোন বাইরের শত্রুর অভিমত বলা যাবেনা। বরঞ্চ আপন গৃহের বন্ধুর অভিমতই মনে করা হবে যা নিছক সত্যের খাতিরে প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যের খেদমত যদি আমার লক্ষ্য না হতো তাহলে অতি সহজেই আমি আমার খান্দানী গদি দখল করে বসতাম এবং পীর-মুরিদীর আসর

জমিয়ে হস্তপদ চুম্বনকারী, নযর-নিয়ায প্রদানকারী বহু মহাত্মাকে আমার চারপাশে ভিড় জমাতে দেখতাম।"

উপরে বলা হয়েছে, একজন মুজাদ্দিদকে ন'টি ক্ষেত্রে কাজ করতে হয়। উপরের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মাওলানা মওদূদী প্রথম সাতটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ইসলামকে একটি নির্ভেজাল খোদাপ্রদত্ত আদর্শ, একটি আন্দোলন, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, জীবনের একটি মিশন হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উপস্থাপনায় কোন অস্পষ্টতা নেই, কোন জটিলতা নেই বা কোন বোধগম্যহীনতা নেই। ইসলামী দুনিয়ার সুধী সমাজ এটার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি জানিয়েছে। তাঁর ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা কোটি কোটি মানুষের জীবনে বিপ্লব এনে দিয়েছে, তাদের মনের ও চিন্তার দুনিয়া বদলে গেছে। আর সারা বিশ্বে ইসলামের এক নবজাগরণ এসেছে।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

একজন মুজাদ্দিদের অবশিষ্ট যে দু'টি কাজ তা হলো, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং অতঃপর একটি বিশ্বজনীন ইসলামী আন্দোলন ও বিপ্লব সৃষ্টি। মাওলানা মওদূদী এ দুটি কাজও অসমাপ্ত রাখেননি। উপরে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হলো, তা ছিল বিশ্বজনীন একটা ইসলামী বিপ্লবেরই পূর্ব প্রস্তুতি।

উনিশ'শ আটত্রিশে আল্লামা ইকবালের আহ্বানে মাওলানা পাঞ্জাব প্রদেশে হিজরত করেন এবং জামালপুর পাঠানকোটে 'দারুল ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা বলেন-

"এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালেমাকে সমুন্নত করা। অর্থাৎ ইসলামী আইনকে মানব রচিত আইনের উপর কার্যতঃ বিজয়ী করা। দ্বিতীয়তঃ যারা ইসলামী আইনের উপর ঈমান রাখে এবং তাকে দুনিয়ার সকল আইনের উপর বিজয়ী করতে চায়, তাদেরকে একত্রে সংগঠিত করা।"

মাওলানা আরও বলেন, "এখন এমন এক সময় এসে পড়েছে যে, আমাদের মুসলমান থাকা না থাকার চূড়ান্ত ফয়সালা করতে হবে। যদি আমরা মুসলমান থাকতে চাই তাহলে আমাদের পরিবেশ ও সমগ্র দুনিয়াকে **'দারুল ইসলাম'** বানাবার সংকল্প করতে হবে। তার জন্যে জীবনের পুরোপুরি ঝুঁকি নিতে হবে। এতোটুকু সাহস যদি আমাদের না থাকে তাহলে ইসলাম থেকে চিরতরে সম্পর্ক

ছিন্ন করার জন্যে তৈরী হতে হবে। কারণ ভারত উপমহাদেশে ভৌগলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করছে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার স্তন্য পান করে সেটা তাজা হচ্ছে, তাকে আপন প্রচেষ্টায় কায়েম করা এবং নিষ্ক্রিয় থেকে তার প্রতিষ্ঠাকে মেনে নেয়ার অর্থ এই যে, মুসলমান এক সর্বগ্রাসী বিপ্লবের স্রোতধারায় বিক্ষিপ্ত খড় কুটার মতো ভেসে যাবে। অবশেষে এমন এক সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে একাকার হয়ে যাবে যা আকীদাহ্ এবং আমল উভয় দিক দিয়ে হবে একেবারে ইসলাম বিরোধী।"

মাওলানা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ও মিশন সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ উদ্দেশ্যে আমাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হয়েছে। বস্তুতঃ তর্জুমানুল কুরআনের প্রাথমিক তিন-চার বছর (১৯৩২-৩৫ সাল) আমি এ চেষ্টা-চরিত্রে অতিবাহিত করেছি যে, মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ধর্মহীনতার যে গতিবেগ দেখা যাচ্ছিল এবং ইসলাম থেকে দৈনন্দিন তাদের যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছিল তা কি করে প্রতিরোধ করা যায়।

এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে যে, মুসলমানের বংশে বা ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেই তাকে মুসলমান বলা হবে। কিন্তু মুসলমান কোন বংশানুক্রমিক অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন বস্তুর নাম নয়। বরঞ্চ একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী ও তদনুযায়ী কর্মশীল একটি দলের সদস্যের নাম মুসলমান। এ সম্পর্কে মাওলানা বড়ো সুন্দর উক্তি করেছেন। তিনি বলেন- "ইসলাম যদি শুধু ঐ ধর্মের নাম হতো যা এখন মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে, তাহলে হয়তো বা আমিও একজন নাস্তিক ধর্মহীন হয়ে পড়তাম। কিন্তু যে জিনিস আমাকে নাস্তিক্যের পথ থেকে রক্ষা করেছে এবং নতুন করে মুসলমান বানিয়েছে তা কুরআন ও সীরাত পাকের অধ্যয়ন। এ আমাকে মানবতার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেছে। এ আমাকে স্বাধীনতার এমন এক ধারণা দান করেছে যার উচ্চতায় কোন উদারপন্থী অথবা কোন বিপ্লবীর ধারণা পৌঁছতে পারেনা।

অতএব প্রকৃতপক্ষে আমি একজন নওমুসলিম। অনেক ভাবনা চিন্তা করে এবং যাচাই-বাছাই করে আমি এ মতাদর্শের উপর ঈমান এনেছি যার সম্পর্কে আমার মন মস্তিস্ক এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মানুষের জন্যে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির কোন পথ

এছাড়া আর নেই।"

অতঃপর মাওলানা বলেন, "আমি শুধু অমুসলিমদেরকেই নয়, বরঞ্চ মুসলমানদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ..... আসুন আমরা ঐসব জুলুম ও খোদাদ্রোহীতা নির্মূল করি যা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব খতম করে দিই এবং কুরআনের নক্শার উপরে এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি কর যেখানে মানুষ মানুষের মর্যাদা লাভ করবে, যেখানে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার এবং সুবিচার ও দয়া সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।"

এ ছিল মাওলানার এক সঠিক বিপ্লবের আহ্বান, এক নতুন সমাজ-সভ্যতা গঠনের আহ্বান, ইসলামী বিপ্লবের আহ্বান।

এ বিপ্লবের ডাক দেয়ার পর যারা ডাকে সাড়া দিতে চান তাদের দৃষ্টি একটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে মাওলানা বলেন-

"দুনিয়ায় যখন কোন আন্দোলন কোন নৈতিক অথবা সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উত্থিত হয়, তখন তাতে তারাই অংশ গ্রহণ করে যাদের মনে সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তার মূলনীতি আবেদন সৃষ্টি করে, যাদের স্বভাব প্রকৃতি সে আন্দোলনের রুচি প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল হয়, যাদের অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, এ আন্দোলনই সঠিক ও ন্যায়সংগত, এবং যারা আন্তরিক আগ্রহ সহকারে তা পরিচালনা করতে ও দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে সামনে অগ্রসর হয়। এ আন্দোলনে যারা অংশ গ্রহণ করে তাদেরকে আনা হয়না, বরঞ্চ তারা স্বয়ং আসে। তারা আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে আপন উদ্দেশ্য মনে করে কাজ করে। তাদের জন্যে এ আন্দোলন পরিচালনা তাদের জীবনের মিশন হয়ে পড়ে।

এটাই কারণ যে, যখন কেউ কোন আন্দোলনের সত্যতা স্বীকার করে তা গ্রহণ করে, তখন তার জীবনের কায়া পরিবর্তন হয়। সে পূর্ব থেকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন সত্তা হয়ে পড়ে। সে তার নীতির জন্যে বন্ধুত্ব এবং সগোত্রীয় সম্পর্ক সম্বন্ধ (Blood relation) পর্যন্ত উৎসর্গ করে। সে তার কায়-কারবার, আপন পজিশন, ধনসম্পদ এবং প্রতিটি বস্তুর ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এমনকি কারাজীবনের দুঃখ কষ্ট এবং জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়। এ বিপ্লব এমন সার্বিক ও সর্বব্যাপী হয় যে, তার অভ্যাস বদলে যায়, স্বভাব-প্রকৃতি বদলে যায়। এমনকি তার আকার আকৃতি, চেহারা সূরত, লেবাস-পোষাক, খানাপিনা এবং সাধারণ জীবন-যাপন পদ্ধতির উপরেও সে বিপ্লবের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তার আশপাশের লোকের মধ্যে তাকে আলাদা করে চিনতে পারা যায়। তাকে

দেখে প্রত্যেকেই বলে ওঠে ঐ দেখ যাচ্ছে অমুক আন্দোলনের লোক।" (তর্জুমানুল কুরআন, ১৯৩৯)

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে ঐ ধরনের পঁচাত্তর জন লোক নিয়ে ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী নামে একটি আদর্শবাদী দল মাওলানার নেতৃত্বে গঠিত হয়। ঠিক তার ছ'বছর পর ভারত উপমহাদেশ পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন দেশে বিভক্ত হয়। ছ'-সাত বছরে মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে গঠিত জামায়াতে ইসলামী এতোটা শক্তিশালী হয় যে তার দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের ধর্মবিমুখ শাসকগোষ্ঠী ইসলামের মৌলিক নীতি ভিত্তিক ঐতিহাসিক আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

এ জামায়াত প্রতিষ্ঠার দিনেই জামায়াতের কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা বলেন, জামায়াতে ইসলামীর জন্যে দুনিয়ায় করার যে কাজ সে সম্পর্কে কোন সীমিত সংকীর্ণ ধারণা মনে পোষণ করবেননা।

গোটা মানব জীবনের সকল প্রশস্ত দিক ও বিভাগ রয়েছে তার কাজের পরিসীমার আওতাধীন। ইসলাম সকল মানবের জন্যে এবং মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সকল বস্তু ইসলামের সাথেও সম্পৃক্ত। অতএব ইসলামী আন্দোলন এক সর্বব্যাপী আন্দোলন।

"জামায়াতে যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, জামায়াত যে কাজ করতে চায় তা কোন সহজ-সাধ্য কাজ নয়। তাকে দুনিয়ার সমগ্র ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে। দুনিয়ার নৈতিক মূল্যবোধ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব কিছুই পরিবর্তন করতে হবে। খোদাদ্রোহীতার ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা দুনিয়ায় কায়েম আছে তা পরিবর্তন করে তা কয়েম করতে হবে খোদার আনুগত্যের ভিত্তিতে। এ কাজ করতে হলে তাকে লড়তে হবে সকল শয়তানী শক্তিত বিরুদ্ধে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপের পূর্বে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে কোন্ কন্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়ানো হচ্ছে।"

ইসলামী বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে নবী মুস্তাফা (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) আদর্শের আলোকে জামায়াত কর্মীদের স্থায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সমাজ সেবা প্রতিটি বিষয়ে জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। জামায়াতের বিপুল সাহিত্য ভান্ডার সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামী বিপ্লবের সপক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করে। ফলে সারা বিশ্বে ইসলামের জাগরণ শুরু হয়েছে এবং অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হয়েছে। শাসকগণের এ ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব থাকলেও ইসলামকে মানব জাতির পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে ঘোষণা করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। এটা মাওলানা মওদূদীর আজীবন সাধনারই ফল, তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। আজ বিশ্বব্যাপী মুসলিম যুব সমাজে ইসলামের যে জাগরণ এসেছে তা মাওলানার ইসলামী বিপ্লবের আহ্বানকে কার্যকর না করে ছাড়বে না।

রাজনীতির অংগনে মাওলানার অবদান

একজন সমাজ সংস্কারককে তাঁর সামাজিক পরিবেশের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হয় যাতে করে কোন ছিদ্র পথে জাহেলিয়াতের স্রোতধারা প্রবেশ করে সমাজকে ভেসে নিয়ে না যায়, সমাজের অবশিষ্ট নৈতিক ও ইসলামী মূল্যবোধটুকু ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে না যায়। ইসলামের সংস্কারক হিসাবে তিনি প্রথম কয়েক বছর মানুষকে প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরে আনার আহ্বান জানান। হঠাৎ জাহেলিয়াতের এক প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয় এবং মাওলানার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি বলেন -

এ প্রচেষ্টা চলছিল, হঠাৎ ১৯৩৭ সালে এ আশঙ্কা দেখা দিল যে, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের যে আন্দোলন চলছিল এবং যা প্রবল ঝঞ্ঝাবেগে সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, ভারতীয় মুসলমান তার শিকার হয়ে না পড়ে। অতএব এ আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে আমি 'মুসলমান এবং বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত' শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লেখা শুরু করি। এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার এই ছিল যাতে করে মুসলমান অন্ততঃপক্ষে মুসলমানীত্বের নিম্নপর্যায়ে যেতে না পারে এবং আপন স্বাতন্ত্র হারিয়ে না ফেলে। সেজন্যে আমি তাদের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তার প্রেরণা জাগ্রত করার চেষ্টা করি। ঐ ধর্মহীন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনিষ্টকারীতা সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেই যা অমূলক এক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছিল। যেসব 'আইনানুগ রক্ষা কবচ' ও মৌলিক অধিকারের উপর আস্থা পোষণ করে মুসলমান সেই মারাত্মক গণতান্ত্রিক সংবিধানের জালে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আমি তুলে ধরি। এ কথা সত্য যে, যে ব্যক্তি ইসলামকে এখানে সমুন্নত করতে চায় সে অবশ্যই এ কথা মনে করবে যে তার কাছে যতোটুকু মূলধন রয়েছে তা যেন বিনষ্ট না হয়। তারপর সে অতিরিক্ত মূলধন

সংগ্রহের চেষ্টা করবে। যারা প্রথম থেকেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এ কলেমায় বিশ্বাসী এবং নিজেকে মুসলমান বলে, তার সম্পর্কে আমাদের এ চিন্তা থাকা দরকার যে, সে যেন হারিয়ে না যায়। সে জন্যে মুসলমানদেরকে অমুসলিম জাতীয়তার মধ্যে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম, তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করলাম যে, তাদের একটা শাশ্বত জাতীয়তা রয়েছে। এ জন্যে এটা তাদের জন্যে কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তারা অন্য কোন জাতীয়তার মধ্যে একাকার হয়ে যাবে।

কুরআন সুন্নাহ এবং ইসলামের অতীত ইতিহাসের নিরিখে এ সম্পর্কে মাওলানার বিস্তারিত আলোচনা 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে। পরিতাপের বিষয় মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক জাতীয়তাবাদের নামে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল তার জালে আবদ্ধ হওয়া থেকে ভারতের তৎকালীন খ্যাতনামা আলেমগণও নিজেদেরকে বাঁচাতে পারেননি। তাঁরা অন্ধভাবে এক জাতীয়তাবাদ সমর্থ করেন। মাওলানার বলিষ্ঠ লেখনী এ ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে।

উনিশ'শ উনচল্লিশ নাগাদ মুসলমান জাতি যখন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র নেতৃত্বে মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন মাওলানা বলেন, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেছে, তাদের মধ্যে এখন নিজস্ব জাতীয়তার অনুভূতি এতোটা সুদৃঢ় হয়েছে যে, কোন নেহেরু এবং কোন গান্ধীর এ সাধ্য নেই যে তাদেরকে হিন্দুদের মধ্যে অথবা হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে একাকার করে ফেলবে।

কিন্তু এর একটা উল্টো ফল হলো। তারা এক প্রান্তদেশ (Extreme) থেকে আর এক প্রান্তদেশে পৌছলো। তারা ভৌগলিক একজাতীয়তাবাদের খপ্পর থেকে অন্ধ মুসলিম জাতীয়তাবাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। মাওলানা দুঃখ করে বলেন -

অবস্থা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে, একবার এক বিশিষ্ট মুসলিম নেতা এই বলে অভিযোগ করেন যে, বোম্বাই ও কোলকাতার ধনবান মুসলমানগণ অ্যাংলোইন্ডিয়ান-বারাংগনাদের কাছে যায়। অথচ মুসলমান বারাংগনাগণ তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অধিকতর হকদার। এ চরম সীমায় পৌছে যাবার পর মুসলিম জাতীয়তাবাদ সমর্থন করা আমার জন্যে বিরাট গোনাহের কাজ হবে।

মাওলানা বলেন, মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা জাতিপূজার এ নতুন আন্দোলনের সময়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব এমন এক দলের হাতে চলে যায়, যারা দ্বীনী

জ্ঞানবিবর্জিত এবং নিছক জাতিপূজার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পার্থিব স্বার্থের জন্যে কাজ করছে। দ্বীনী জ্ঞান রাখেন এমন লোকের সংখ্যা এ দলে একেবারে নগণ্য এ অনুল্লেখযোগ্য। .... ভারতে ইতিপূর্বে মুসলমানদের আস্থা ওলামায়ে কেরামের উপর থেকে উঠে গিয়ে এমন সব লোকের উপর কখনো দৃঢ় নিবদ্ধ হয়নি যারা অ-দ্বীনদার এবং দ্বীন সম্পর্কে অনবহিত। ..... তাহলে আমরা কি খোদার প্রতি ঈমানপোষণকারী খোদার বান্দাহদেরকে খোদার পরিবর্তে অন্য কোন যুক্ত-আনুগত্যের উপর একত্র হতে দেখে চুপ করে থাকব ?

ভারতে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হতে যাচ্ছিল, মাওলানা তার চক্ষু বন্ধ করতে পারেননি। বৃটিশ চাচ্ছিল একজাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে অর্থাৎ হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় গ্রহণ করবে। এর ভয়াবহ পরিণাম ফল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যে মাওলানা উনিশ'শ আটত্রিশের শেষে তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব জাতির সামনে রাখেন। তার তৃতীয় বিকল্প ছিল দেশবিভাগ। এর তেরো মাস পরে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। মাওলানার বিচক্ষণ ও সূক্ষ্ম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর লিখিত 'সিয়াসি কাশমাকাশ' (উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান) গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতিতে মাওলানা তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন। রাজনৈতিক প্রতিভা ও দূরদর্শিতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তাই তিনি তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা থেকে সুদূর ভবিষ্যতের যে চিত্র এঁকে দিতেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হতে দেখা গেছে। শুধু ইসলামের প্রশ্নে শাসকগণ তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলেও জাতির জটিল প্রশ্নে তাঁর সুপরামর্শ নিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মাওলানার অবদান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর দাওয়াত, বাণী ও আদর্শ ছিল যেহেতু আন্তর্জাতিক, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে, তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলনা কোন ভৌগলিক দেশ ভিত্তিক, বরঞ্চ আন্তর্জাতিক এবং সেজন্যে তিনি ছিলেন সকল আঞ্চলিকতা, স্বজনপ্রীতি ও একদেশদর্শিতার বহু উর্ধে। তাই সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে সাইয়েদ মওদূদী একটি অতি প্রিয় নাম, সকলের

আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার পাত্র। উপরন্তু তিনি আধুনিক ও ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তা গবেষণার বিশ্বকোষ।

তাঁর মূল পরিকল্পনার ভিত্তিতে মদীনায় যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চলছে তাতে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি থেকে শত শত ছাত্র জ্ঞানলাভ করছে এবং তাদের মধ্যে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে।

মক্কা মুকাররামায় ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী সম্মেলনে মাওলানা যোগদান করেন এবং ইসলামী বিশ্বের সাথে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপনকারী 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী' নামক সংস্থার প্রতিষ্ঠায় মাওলানার অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি একান্তভাবে কামনা করতেন যে, বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ইসলামের ভিত্তিতে একটি 'কমনওয়েলথ্' গঠিত হোক। এসম্পর্কে তিনি বার বার সউদী আরবের বাদশাহ শাহ্ ফয়সালকে অনুরোধ জানান। অবশেষে ষাটের দশকের শেষাংশে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলির শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামী সেক্রেটারিয়েট সংস্থা গঠন করা হয়। একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে মাওলানা এ সম্মেলনে যোগদান করেন।

তিনি ইসলামী সেক্রেটারিয়েটের সামনে কতগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখেন তার মধ্যে অন্যতম মুসলমানদের নিজস্ব একটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা এবং একটি সম্মিলিত অস্ত্র নির্মাণ কারখানা।

মাওলানার ক্রমাগত অসুস্থতার কারণে এসব বিষয়ে তিনি চাপ সৃষ্টি করতে পারেননি এবং বিশেষ করে শাহ ফয়সালের শাহাদতের পর মাওলানার প্রস্তাব ও পরামর্শগুলি কার্যকর হতে পারেনি।

মাওলানা আরব দেশ ভ্রমনকালে আরব জাতীয়তার তীব্র সমালোচনা করে তার অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করেন। ইসলামী সেক্রেটারিয়েটকে তার বিকল্প বলা যেতে পারে। কিন্তু এখনো তার সত্যিকার রূপ প্রকট হয়নি।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মাওলানা বিশ্বমানবতার আহ্বায়ক ছিলেন এবং মুসলিম উম্মার ঐক্যের প্রবক্তা ছিলেন। তাই মিল্লাতের জন্যে তাঁর বহুমুখী অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান

হাদীস অমান্যকারীদের পক্ষ থেকে শুধু বোখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থ থেকে বেছে বেছে এমন পনেরো বিশটি হাদীস উপস্থাপন করা হয় যা সাধারণ বুদ্ধি বিবেকের কষ্টি পাথরে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এর ভিত্তিতে হাদীস আমান্যকারীগণ গোটা হাদীস শাস্ত্রকে অমূলক ও অবিশ্বাস্য প্রমাণ করার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে হাদীসগুলিকে সহীহ্ এবং বিবেক সম্মত বলে কেউ প্রমাণ করতে পারেননি। ফলে হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে দক্ষতা রাখেন এমন অনেকের মনেও দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাঁরা মাওলানা মওদূদীর কাছে এর ব্যাখ্যা দাবী করলে তিনি সে সবের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা দান করে সত্যতা প্রমাণ করেন যে, সে সম্পর্কে সকল সন্দেহের অবসান হয়। কুরআনের তফসীরের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক অনুসন্ধিৎসু মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করেন। এভাবে তিনি হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হন। (রাসায়েল ও মাসায়েল, দ্বিতীয় খন্ড দ্রষ্টব্য)।

উপরন্তু সোশ্যালিজম, কমিউনিজম, পুঁজিবাদ, কাদিয়ানী আন্দোলন, ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি 'ইজম' ও মতবাদগুলি ইসলামের মূল প্রাণশক্তি গ্রাস করছিল। মাওলানা তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এসব জাহেলী মতবাদের কোমর ভেঙে দিয়েছেন। কাদিয়ানী সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে আইনগতভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু বলে ঘোষিত হয়েছে। কোন আরব মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের প্রবেশাধিকার নেই।

মাওলানার তাফসীরগ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' এবং 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' তাঁর ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও ইজতিহাদের স্বর্ণ ফসল।

কুরআন বিরাট ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী সমষ্টি। বহু পাষাণ হৃদয় কাফেরের হৃদয় বিগলিত করেছে কুরআনের সুললিত ছন্দও শব্দ ঝংকার। ইসলাম দুশমন ওত্‌বা বিন রাবেয়া কিছুক্ষণ কোরআন পাঠ শুনার পর তার শিরা-উপশিরায় কুরআনের প্রভাব অনুভব করে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার হাত দিয়ে নবী পাকের মুখ চেপে ধরে বলে- "আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমার আপনজাতির উপর রহম কর।"

কুরআনের সম্মোহানী শক্তি দুর্ধর্ষ ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) কে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় টেনে এনেছিল। কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বাদশাহ নাজ্জাশীর গন্ডদেশ অশ্রু প্লাবিত হয়েছিল। কুরআনের ভাষা ও মর্ম ছিল তাদের কাছে সহজ

সরল ও বোধগম্য। তাই তাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। মাওলানা মওদূদী আরবী ভাষার কুরআনকে তার মূলমর্ম, ভাবধারা ও প্রাণ শক্তিসহ এমনভাবে উর্দূ ভাষায় ভাষান্তরিত করেছেন যে তা পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করে। কুরআনের বাণী জীবনে প্রতিফলিত করার জন্যে অধীর ও কর্মচঞ্চল করে তোলে।

এমনিভাবে মাওলানা তাফসীর শাস্ত্রে এক বিপ্লব আনয়ন করেছেন। তাঁর তাফসীর সারা বিশ্বে ইসলামের এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে।

সীরাতে সরওয়ারে আলম

মাওলানার আর একটি শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর প্রণীত 'সীরাতে সরওয়ারে আলম'।

নবী পাক ছিলেন কুরআনপাকের বাস্তব চিত্র। তাই মাওলানা নবী জীবনকে কুরআন পাকের সাথে মিলিয়ে এবং তাঁর গোটা জীবনকে কুরআনের ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এর সপক্ষে হাদীসের ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে তথ্য পরিবেশন করেছেন।

তাঁর প্রণীত সীরাত এক অনুপম গ্রন্থ। একদিকে কুরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর সঠিক জীবন চিত্র অংকিত করা হয়েছে। অপরদিকে গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে নবীর প্রতি তাঁর অগাধ প্রেম ও ভালবাসা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও পরিপূর্ণ পদাংক অনুসরনের অদম্য প্রেরণা পরিস্ফুটিত হয়েছে।

তাঁর প্রণীত সীরাত দু'খন্ডে প্রকাশিত এবং তা শুধু মক্কী জীবন সম্পর্কে। নবী পাকের (সঃ) মাদানী জীবনের উপর লেখা শুরু করার পূর্বেই তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর ইপ্সিত এ কাজটি অসমাপ্তই রয়ে যায়।

শেষ কথা এই যে, মাওলানা কোন নবী ছিলেননা। তিনি একজন মানুষ এবং তাঁর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অতি স্বাভাবিক। তিনি নিজেও এ সত্যটি ব্যক্ত করে বলেছেন, আমরা কোন দিন ভুল করিনি বা করবোনা এমন ভুল উক্তি কোন দিন করবোনা। কেউ আমাদের ভুল কুরআন ও সুন্নাতের কষ্টিপাথরে ধরিয়ে দিলে তা সংশোধন করতে বাধ্য থাকব।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যারাই তাঁর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন তার বুনিয়াদ কুরআন ও সুন্নাহ নয়। বরঞ্চ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। মাওলানা প্রত্যুত্তরে তাঁদের প্রতি কোন মন্দ ভাষা প্রয়োগ করেননি বরঞ্চ কুরআন পাকের এ নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছেন-

'আমি বুঝতে পারছি তারা আমার নেকীর পাল্লা ভারী করার কাজে লেগে আছেন। সেজন্যে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

সর্বশেষ, শ্রদ্ধেয় সুধী সমাজের কাছে একটি আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

মাওলানা মওদূদী হরহামেশা সত্যের প্রচার করেছেন। মিথ্যা, অবিচার, দূর্নীতি ও জুলুম নিস্পেষণের বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলেছেন। তাঁর সত্য ভাষণ সেজন্যে অপ্রিয় করেছে তাঁর আপনজনকে, অপ্রিয় করেছে তাঁর বন্ধু-বান্ধবকে, অপ্রিয় করেছে অনেক বুযর্গানে কওমকে।

তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু যার তিনি আজীবন খেদমত করেছেন, তাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। নতুন অলংকারে ভুষিত করেছেন। কিন্তু তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সকল ভাষার প্রতি এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সপক্ষে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অখন্ড পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের উপরে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের অবিচার ও পক্ষপাতমূলক আচরণের তীব্র সমালোচনা করে সমাধান পেশ করেছেন।

মাওলানার জীবন ও কর্মসাধনা ছিল আয়নার মতো স্বচ্ছ, অমলীন ও সুস্পষ্ট। তাই সুধী মহলের কাছে আবেদন, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী সহ মাওলানার সত্যিকার পরিচয় জানবার চেষ্টা করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর বিপুল সাহিত্য ভান্ডার এতো বেগবান, সাবলিল ও হৃদয়গ্রাহী যে পাঠকের হৃদয় মন আলোড়িত না হয়ে পারেনা। তাঁর সাহিত্য পাঠের মাধ্যমেই তাঁর সত্যিকার পরিচয় হৃদয় মনের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁর চিন্তাধারার উপর গবেষণার জন্যেও চিন্তাশীল মহলের প্রতি আবেদন জানাই।

এক নজরে

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

বিংশ শতাব্দীর কালজয়ী ইসলামী চিন্তাবিদ, শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, মুজতাহিদ, বিপ্লবী তাফসীর লেখক, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কুরআন হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের মহাপন্ডিত, সাহিত্য সম্রাট, হৃদয় জয়কারী সুদক্ষ বাগ্মী, সংগঠক, উস্তাদ ও মুর্শেদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর

জীবনপঞ্জী

১৯০৩ সাল	-	হায়দারাবাদ রাজ্যের আওরংগবাদ শহরে জন্ম।
১৯০৬-১৬	-	গৃহে প্রাথমিক শিক্ষার পর মৌলভী পাশ ও হায়দারাবাদ দারুল উলুমে শিক্ষা লাভ।
১৯১৮-২৮	-	সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ ও বিভিন্ন সংবাদপত্র সম্পদনার দায়িত্ব পালন। এ সময়ে চার-পাঁচ বছর যাবত দিল্লীতে প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীনের কাছে হাদীস তাফসীর, আরবী সাহিত্য, মায়ানী ও বালাগাত, ফেকাহ শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন এবং ইংরেজী ও জার্মান ভাষা শিক্ষা লাভ।
১৯২৮	-	ভারতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করার প্রশ্নে দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'আলজমিয়ত' পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সাথে মতানৈক্যের কারণে উক্ত পত্রিকা থেকে এস্তেফা দান।
১৯২৮-৩১	-	দিল্লী, ভূপাল ও অন্যান্য শহরের প্রসিদ্ধ পাঠাগারগুলো থেকে দ্বীন ইসলাম ও বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক জ্ঞানলাভ।
১৯৩১	-	হায়দারাবাদ থেকে মাসিক তর্জুমানুল কুরআন প্রকাশ যা অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশ লাভ করছে।
১৯৩১-৩৬	-	আল্লামা ইকবালের সাথে পত্র বিনিময়ের সূচনা। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে একটি সার্বিক শিক্ষা

খসড়া প্রণয়ন।

১৯৩৮ - আল্লামা ইকবালের আহ্বানে হায়দারাবাদ থেকে পাঞ্জাবে হিজরত। পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটে 'দারুল ইসলাম' সংস্থার প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৮ - মাসিক তর্জুমানুল কুরআনের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় দেশের সামনে তিনিট বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ।

১৯৪০ - ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার খসড়া প্রণয়নের জন্যে ইউ-পি-মুসলিম লীগ কর্তৃক কমিটি গঠন ও মাওলানাকে তার সদস্য মনোনয়ন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামী হুকুমত কিস্ তরাহ্ কায়েম হুতি হ্যায়' - বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণদান- যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৪১,২৬শে আগষ্ট- ৭৫ জন লোক নিয়ে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি আদর্শবাদী দল গঠন। মাওলানা তার আমীর নির্বাচিত।

১৯৪৩ - বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসীর- 'তাফহীমুল কুরআনের' সূচনা।

১৯৪৪-৪৬ - ইসলামী আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও সুসংহতকরণ। বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও সাময়িকীর প্রকাশ।

১৯৪৭,২৮ শে আগষ্ট- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে পাকিস্তান বিরোধীদের পক্ষ থেকে সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দাবানল সৃষ্টি। পাঠান কোট হিন্দুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় মাওলানা মুষ্টিমেয় মুসলমানসহ লাহোরে হিজরত করতে বাধ্য হন।

১৯৪৮ পাকিস্তান পতিষ্ঠার পাঁচ মাস পর থেকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু। ৬ই জানুয়ারী লাহোর আইন কলেজে ইসলামী আইনের উপর ভাষণ দানকালে মাওলানা ইসলামী আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের দাবী পেশ করেন।

- ৬ ই মার্চ করাচীর জাহাঙ্গীর পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় মাওলানা কর্তৃক ইসলামী শাসন ব্যবস্থার জন্যে ৪-দফা দাবী পেশ।

- সরকারের পক্ষ থেকে মাওলানার প্রতি কতিপয় ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ ও ১২ ই অক্টোবর তাকে গ্রেফতার।

১৯৪৯,১২ ই মার্চ- দেশব্যাপী প্রচন্ড আন্দোলনের ফলে সরকার 'আদর্শ প্রস্তাব' পাশ করেন। পরদিন জামায়াতে ইসলামীর তিন দিনব্যাপী প্রথম নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন।

১৯৫০,২৮শে মে - মাওলানার মুক্তি। সারাদেশে জনসভায় মাওলানার ভাষণ।

১৯৫১ - করাচীতে ঐতিহাসিক সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে মাওলানার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় পালন। সম্মেলনে ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ গৃহীত।

নভেম্বর মাসে - করাচীতে জামায়াতের দ্বিতীয় নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন।

১৯৫২ - গণপরিষদের কাছে ৮ দফা দাবী পেশ। ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলন। কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণার দাবীতে করাচীতে সর্বদলীয় সম্মেলনে মাওলানার অংশগ্রহণ।

১৯৫৩ ফেব্রুয়ারী- সর্বদলীয় সম্মেলনের পক্ষ থেকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' ঘোষণা। জামায়াতের পক্ষ থেকে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের বিরোধিতা ও সম্মেলন বর্জন। মাওলানা কর্তৃক 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক পুস্তক প্রণয়ন। ২৮ শে মার্চ সামরিক আইনের অধীনে মাওলানার গ্রেফতারী। মে মাসে সামরিক আদালতে মাওলানার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। ১১ ই মে সামরিক আদালত কর্তৃক মাওলানার প্রতি মৃত্যুদন্ডাদেশ। বিশ্বব্যাপী প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রতিবাদের ফলে মৃত্যুদন্ড যাবজ্জীবন কারাদন্ডে রূপান্তরিত।

১৯৫৫,২৯ শে এপ্রিল- নিছক আইনগত কারণে মাওলানার নিঃশর্ত মুক্তি। নভেম্বরে করাচীতে জামায়াতের তৃতীয় নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন।

১৯৫৬ - ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলন। দু'মাসব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও তার অপূর্ব ও সুষ্ঠু সমাধান পেশ।

১৯৫৭ - বাহওয়ালপুরের মাছিগোটে জামায়াতের নিখিল পাকিস্তান সদস্য সম্মেলন। মাওলানার ঐতিহাসিক ভাষণ-যা 'ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ।

১৯৫৮ - সামরিক শাসনের প্রস্তুতি। ৭ই অক্টোবর লাহোরের মুচি দরজায় এক জনসমুদ্রে ভাষণ দানকালে সরকারের প্রতি মাওলানার সতর্কবাণী উচ্চারণ। পরদিন সারাদেশে সামরিক শাসন। বছরের প্রথমদিকে তিনি দ্বিতীয়বার পূর্ব-পাক সফর করেন।

১৯৫৯ - তাফহীমুল কুরআনের জন্যে কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানগুলি স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে মাওলানার মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ ও হজ্ব পালন। ভ্রমনকালে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়ে সর্বত্র ভাষণদান এবং পাকিস্তানের ভাবমূর্তিকে সমুন্নতকরণ।

১৯৬০ - দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ। ডিসেম্বরে সউদী আরবের বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আযীযের অনুরোধে মাওলানা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া পরিকল্পনা মক্কায় আহূত এক বৈঠকে পেশ করেন ও তা সামান্য সংশোধনীসহ গৃহীত হয়।

১৯৬১ - আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম বিরোধী পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন।

- আফ্রিকার মুসলমানদের আমন্ত্রণে ভ্রমনের উদ্যোগ নেয়ার পর সরকার অন্যায়ভাবে তা বন্ধ করেন।

- হাদীস অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এ বিষয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন।

১৯৬২ - মক্কায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী সম্মেলনে যোগদান। রাবেতায়ে আলমে ইসলামী সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও মাওলানা তার আজীবন সদস্য নির্বাচিত।

১৯৬৩ - লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সম্মেলনে ভাষণ দানকালে সরকার নিয়োজিত গুন্ডাবাহিনী কর্তৃক মাওলানাকে লক্ষ্য করে গুলী বর্ষণ। সম্মেলন পন্ড করার সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ।

১৯৬৪,৪ঠা জানুয়ারী- অবৈধভাবে জামায়াতে ইসলামী বেআইনী ঘোষিত। কেন্দ্রীয় শূরার সদস্যগণ সহ মাওলানার গ্রেফতারী। ১৯শে জানুয়ারী জামায়াতের সকল রেকর্ডপত্র বাজেয়াপ্তকরণ। ২৫শে মে সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্টের রায় সরকারের পদক্ষেপকে আইন বিরুদ্ধ ঘোষণা করে। জামায়াত পুনর্বহাল হয় এবং নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৫ - মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠকে মাওলানার অংশগ্রহণের পূর্বে মাওলানার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্তকরণ।

৬ ই সেপ্টেম্বর ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমণ। রেডিও পাকিস্তান থেকে মাওলানার ক্রমাগত 'জেহাদের' উপর ছ'টি ভাষণদান। জামায়াতের পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ।

১৯৬৬ - লাহোরে সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে মাওলানার তাসখন্দ চুক্তির সমালোচনা। পূর্ব পাকিস্তান সফর। রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর বৈঠকে কাশ্মীর সম্পর্কে বহু তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আরবী ও ইংরেজী ভাষায় মাওলানা প্রণীত পুস্তিকা বিতরণ।

১৯৬৭ - ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাপার নিয়ে মাওলানা সহ অন্য চারজন খ্যাতনামা আলেমের গ্রেফতারি।

১৯৬৮ - চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাওলানার লন্ডন ভ্রমণ। ইংলন্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের পক্ষ থেকে হিল্টন হোটেলে লন্ডনে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় মাওলানার ভাষণ।

১৯৬৯ - রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান।

১৯৭২ - তাফহীমুল কুরআনের সমাপ্তি ও ষষ্ঠ খন্ড প্রকাশ। অবিরাম অসুস্থতার কারণে জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব থেকে এস্তফা দান।

১৯৭৯ - চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ২১শে মে আমেরিকা গমন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মুত্রাশায় অপারেশন।

- ২২ শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা পৌনে ছ'টায় ইন্তেকাল।

- ইন্তেকালের পর বাফেলো, লন্ডন, করাচীতে একাধিকবার জানাযা হয় এবং ২৬ শে সেপ্টেম্বর লাহোর গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে কয়েক লক্ষ্য শোকাতুর মানুষের সমাবেশ জানাযার পর আপন বাসগৃহে মাওলানাকে দাফন করা হয় ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

মাওলানা মওদূদী প্রণীত গ্রন্থাবলী

ক. কুরআন

১. তরজমায়ে কুরআন মজীদ ঃ পৃ ১২৪৮
২. তাফহীমুল কুরআন ১-১৯ খন্ড ঃ পৃ ৪১৬৫
৩. তাফহীমুল কুরআনের বিষয় সূচী ঃ পৃ ৫৪০
৪. কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা ঃ পৃ ১১৯ (কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহে)
৫. কুরআনের মর্মকথা ঃ পৃ ৪৮

খ. হাদীস/সুন্নাহ

৬. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা ঃ পৃ ৩৩৬ (সুন্নাত কী আইনী হাইসিয়াত)
৭. কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা (হাদীসের আলোকে) ঃ পৃ ১৩৩ (ফাযায়েলে কুরআন)

গ. ইসলামী জীবন দর্শন

৮. ইসলাম পরিচিতি ঃ পৃ ১১২ (রিসালায়ে দীনিয়াত)
৯. তাওহীদ রিসালাত আখিরাত ঃ পৃ ৪৪
১০. ইসলামের জীবন পদ্ধতি ঃ পৃ ৫৫ (ইসলাম কা নিযামে হায়াত)
১১. একমাত্র ধর্ম ঃ পৃ ৪৫ (দীনে হক)
১২. শান্তি পথ ঃ পৃ ২৭ (সালামতী কা রাস্তা)
১৩. ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা ঃ পৃ ২৭৯ (ইসলামী তাহযীব আওর উসকে উসূল ও মাবাদী)
১৪. নির্বাচিত রচনাবলী ১-৩ খন্ড ঃ ১৩৪৪ (তাফহীমাত)
১৫. আলজিহাদ ঃ পৃ ৫৯২
১৬. ইসলাম ও জাহেলিয়াত ঃ পৃ ৪৮
১৭. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ঃ পৃ ২২৮ (তানকীহাত)
১৮. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা ঃ পৃ ৩৮৪ (ইসলামী নেযামে জিন্দেগী আওর উসকে বুনিয়াদী তাসাওবুরাত)
১৯. ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি ঃ পৃ ৩২ (ইসলাম আওর মাগরিবী দা দীনী জমহুরিয়াত)
২০. ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ ঃ পৃ ৩২ (ইসলাম কা আখলাকী নকতায়ে নযর)

২১. ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ ঃ পৃ ১১৯ (মাসলায়ে কওমীয়াত)
২২. ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার ঃ পৃ ২৪ (ইসলাম আওর আদলে ইজতেমায়ী)
২৩. ইসলামে শক্তির উৎস ঃ পৃ ৬৭ (ইসলাম কা সর চশমায়ে কুওত)
২৪. কুরবাণীর শিক্ষা ঃ পৃ ৪৮
২৫. ঈমানের হাকীকত ঃ পৃ ৪৮
২৬. ইসলামের হাকীকত ঃ পৃ ৪৪
২৭. নামায রোযার হাকীকত ঃ পৃ ৬৫
২৮. হজ্জের হাকীকত ঃ পৃ ৪৮
২৯. যাকাতের হাকীকত ঃ পৃ ৫৮
৩০. জিহাদের হাকীকত ঃ পৃ ২৮
৩১. তাকদীরের হাকীকত ঃ পৃ ১০২ (মাসয়ালায়ে জবর ও কদর)
৩২. শিক্ষাব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ ঃ পৃ ১৩৩ (তা'লীমাত)

ঘ. আইন, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

৩৩. ইসলামী আইন ঃ পৃ ৬৩
৩৪. ইসলামী রাষ্ট্র ঃ পৃ ৭০০ (ইসলামী রিয়াসত)
৩৫. খেলাফত ও রাজতন্ত্র ঃ পৃ ২৯৪ (খেলাফত ও মুলূকিয়াত)
৩৬. ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ ঃ পৃ ৬৩ (ইসলাম কা নযরিয়ায়ে সিয়াসী)
৩৭. উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান. ১-২ খন্ড ঃ পৃ ৮৭৭ (তাহরীকে আযাদী হিন্দ আওর মুসলমান)
৩৮. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ঃ পৃ ৮৬ (ইসলামী দাসতুর কী তাদবীন)
৩৯. ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঃ পৃ ৮৬ (ইসলামী দাসতুর কী বুনিয়াদে)
৪০. মৌলিক মানবাধিকার ঃ পৃ ৩২ (ইনসান কী বুনিয়াদী হুকুক)
৪১. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ঃ পৃ ৫০ (ইসলামী রিয়াসত মে যিম্মীউঁ কে হুকুক)
৪২. দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ পৃ ২৮৬
৪৩. কুরআনের রাজনৈতিক শিক্ষা ঃ পৃ ৫৭ (কুরআন কী সিয়াসী তা'লীমাত)
৪৪. জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি ঃ পৃ ২৪ (কওমী ওয়াহদাত)
৪৫. মুরতাদের শাস্তি ঃ পৃ ৬৮

ঙ. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

৪৬. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি ঃ পৃ ৪৭

৪৭. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন ঃ পৃ ১২২ (তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দীন)
৪৮. জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচী ঃ পৃ ৮০
৪৯. আল্লাহর পথে জিহাদ ঃ পৃ ৩২
৫০. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি ঃ পৃ ৬২
৫১. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী ঃ পৃ ৬৪
৫২. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী ঃ পৃ ৭৮
৫৩. ইসলামী বিপ্লবের পথ ঃ পৃ ৫৬ (ইসলামী হুকুমত কিস তরাহ কায়েম হোতি হ্যায়)
৫৪. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী ঃ পৃ ১৩৪
৫৫. আন্দোলন সংগঠন কর্মী ঃ পৃ ২২৪ (তাহরীক আওর কারকুন)
৫৬. দায়ী ইলাল্লাহ দাওয়াত ইলাল্লাহ ঃ পৃ ৪২
৫৭. ভাঙ্গা ও গড়া ঃ পৃ ৩২ (বানাও আওর বিগাড়)
৫৮. একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন ঃ পৃ ২৩
৫৯. শাহাদাতে হুসাইন (রাঃ) ঃ পৃ ১৬
৬০. বিশ্ব মুসলিম ঐক্যজোট আন্দোলন ঃ পৃ ৪৩
৬১. সত্যের সাক্ষ্য ঃ পৃ ৪০ (শাহাদাতে হক)
৬২. আজকের দুনিয়ায় ইসলাম ঃ পৃ ৪২
৬৩. জামায়াতে ইসলামীর ২৯ বছর ঃ পৃ ৫৪

চ. অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা

৬৪. ইসলামী অর্থনীতি ঃ পৃ ৩২৮ (মাআশিয়াতে ইসলাম)
৬৫. অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান ঃ পৃ ৩৮
৬৬. কুরআনের অর্থনৈতিক নির্দেশিকা ঃ পৃ ৫০ (কুরআন কী মাআশী তা'লীমাত)
৬৭. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ ঃ পৃ ১২৬ (ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী নযরিয়াত)
৬৮. ইস'লামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি ঃ পৃ ৩১
৬৯. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ঃ পৃ ৩০২ (সুদ)
৭০. ভূমির মালিকানা বিধান ঃ পৃ ৯৬ (মাসয়ালায়ে মিলকিয়াতে যমীন)

ছ. দাম্পত্য জীবন ও নারী

৭১. পর্দা ও ইসলাম ঃ পৃ ২৮০
৭২. স্বামী স্ত্রীর অধিকার ঃ পৃ ১৫১ (হুকুকুয যাওজাইন)
৭৩. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ঃ পৃ ১৩১ (ইসলাম আওর জিবতে বেলাদত)

৭৪. মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী ঃ পৃ ২৪

জ. তাযকিয়ায়ে নফস

৭৫. হিদায়াত ঃ পৃ ৫৫
৭৬. ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ঃ পৃ ২৭৪ (খুতবাত)
৭৭. ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা ঃ পৃ ৮৮
৭৮. আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি ঃ পৃ ৪৮ (তাযকিয়ায়ে নফস)

ঝ. সীরাত

৭৯. সীরাতে সরওয়ারে আলম ১-৫ খন্ড ঃ পৃ ১২৭৬
৮০. খতমে নবুওয়ত ঃ পৃ ৭৫
৮১. নবীর কুরআনী পরিচয় ঃ পৃ ৪০ (কুরআন আপনে লানে ওয়ালে কো কিস রং মে পেশ করতা হ্যায়)
৮২. আদর্শ মানব ঃ পৃ ৩২ (সরওয়ারে আলম কা আসলী কারনামা)
৮৩. সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ঃ পৃ ৪০ (মাকামে সাহাবা)

ঞ. সামগ্রিক

৮৪. রাসায়েল ও মাসায়েল ১-৫ খন্ড ঃ পৃ ১৬৭৯
৮৫. যুব সমাজের মুখোমুখি মাওলানা মওদূদী ঃ পৃ ৪৫০ (তাসরীহাত)
৮৬. যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১-২ খন্ড ঃ পৃ ৪৪৮ (ইসতিফসারাত)
৮৭. বিকেলের আসর ১-২ খন্ড ঃ পৃ ২৫০ (আসরী মাজালেস)
৮৮. পত্রাবলী ১-২ খন্ড ঃ পৃ ৪৫৫
৮৯. বেতার বক্তৃতা ঃ পৃ ৮৭ (নশরী তাকরীরে)
৯০. মাওলানা মওদূদীর ইন্টারভিউ ঃ পৃ ৪০০
৯১. খুতবাতুল হারাম ঃ পৃ ৩৮
৯২. পত্রালাপ মাওলানা মওদূদী ও মরিয়ম জামিলা ঃ পৃ ২০০
৯৩. কাদিয়ানী সমস্যা ঃ পৃ ৭০

সমাপ্ত

মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা